ব্যক্তিত্বের বিকাশ

স্বামী বিবেকানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

Part - 1
Page - 1-35

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক
স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ
রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০ ০০৩
email : baghbazar.publication@rkmm.org

প্রথম প্রকাশ
শ্রীশ্রীমায়ের ১৫১তম শুভ জন্মতিথি
৩০ অগ্রহায়ণ ১৪১০/16 December 2003

২৫তম পুনর্মুদ্রণ
পৌষ ১৪২৯
January 2023
6M6C

ISBN 81-8040-466-8

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস
উদ্বোধন প্রকাশন বিভাগ

মুদ্রক
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩০

প্রকাশকের নিবেদন

মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—মানবমনের এই চারিটি পর্যায়ের বিকাশের উপর নির্ভর করিয়াই ঘটিয়া থাকে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণায়ত স্ফুরণ এবং এইরূপ সম্যক বিকাশের ফলেই মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব, যাহা তাহার মধ্যে প্রথম হইতেই বিদ্যমান, তাহার হয় সার্থক অভিব্যক্তি। এই কথাই স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষভাবে বলিয়া গিয়াছেন প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে তাঁহার নানাবিধ বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনায়। স্বামীজীর পত্রাবলী হইতে শুরু করিয়া তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতা, কথোপকথন, আলোচনা ইত্যাদির মধ্যে এই বিষয়ে এইরূপ অতীব মূল্যবান যাহা সব গঠনমূলক ও প্রেরণাদায়ী ধ্যানধারণা ছড়াইয়া আছে, মহীশূরের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিশেষ উদ্যোগ লইয়া তাহার এক সুচিন্তিত সঙ্কলন ইংরাজি এক পুস্তিকার আকারে ১৯৯৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ‘Personality Development’ এই নামে প্রকাশ করিয়া আমাদের দেশের মানুষদের, বিশেষত তরুণ ও যুবসমাজের নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। পুস্তিকাটির পরবর্তী সংস্করণগুলি রামকৃষ্ণ মঠের মায়াবতীস্থ অদ্বৈত আশ্রমের কলকাতা-স্থিত প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। মূল ইংরাজি পুস্তিকাটি তাহার আপন বৈশিষ্ট্যগুণে ও ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ হইয়া ইতোমধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে

এবং নবীন ও প্রবীণ সর্ববিধ স্তরের নরনারীর কাছে এক অমূল্য জীবনবেদরূপে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণে পুস্তিকাটির বাংলা ভাষান্তর প্রকাশনার আশু প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করিয়া আমরা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য ১৫১তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তাহা 'ব্যক্তিত্বের বিকাশ' এই নামে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, মূল পুস্তিকাটিতে স্বামীজীর উদ্ধৃতিগুলির ভাষান্তর উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'বাণী ও রচনা' শীর্ষক স্বামী বিবেকানন্দ রচনাবলী হইতে হুবহু গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবলমাত্র যে কয়টি ক্ষেত্রে ঐ উদ্ধৃতির বাংলা ভাষান্তর 'বাণী ও রচনা'য় পাওয়া যায় নাই, সেই ক্ষেত্রে তাহার নূতন করিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে। এই অনুবাদসমূহ করিয়াছেন শ্রীস্বরাজ মজুমদার। আমরা এইজন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। উল্লেখপঞ্জীতে শেষোক্ত উদ্ধৃতিগুলির ক্ষেত্রে আমরা স্বামীজীর ইংরাজি রচনাবলী Complete Works of Swami Vivekananda-এর খণ্ড ও পত্রসংখ্যা উল্লেখ করিয়াছি।

আশাকরি, এই বাংলা প্রকাশনাটিও মূল ইংরাজি পুস্তিকার মতোই জনপ্রিয়তা অর্জন করিবে।

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর
১৫১তম পুণ্য জন্মতিথি
১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩

ইংরাজি গ্রন্থের প্রকাশকের নিবেদন

সঠিকভাবে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছেই এক কঠিন পরীক্ষা, আবার অর্থবহ ও অভিপ্রেত কর্মও বটে। বিশেষ করিয়া যাহারা যুবক বা যুবতী, যাহাদের মধ্যে অদম্য উৎসাহ ও শক্তি আছে, তাহারা এই প্রচেষ্টার দ্বারা অশেষ লাভবান হইতে পারেন। পরীক্ষা এই অর্থে, এর জন্য প্রয়োজন কঠোর সুনির্দিষ্ট প্রয়াস, অধ্যবসায় এবং সতর্ক দৃষ্টি; এবং অর্থবহ এই জন্য যে, এই জাতীয় কোনও উদ্যমই বিফলে যায় না। বস্তুত প্রচেষ্টা যত গভীর ও আন্তরিক হয়, সাফল্য ও তৃপ্তিও সেই অনুপাতে আসে—কিন্তু আসেই। অধিকন্তু, প্রতিটি মানুষেরই এই চেষ্টা করা উচিত, কারণ জীবনের যে-কোনও ক্ষেত্রেই হোক, ব্যক্তিত্ববিকাশের উপরই সব সাফল্য নির্ভর করে।

স্বামী বিবেকানন্দের লেখায়, কথাবার্তায় এবং বক্তৃতাগুলিতে ব্যক্তিত্ববিকাশ সম্পর্কে অজস্র গঠনমূলক চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে আছে। আমাদের প্রকাশিত 'The Complete Works of Swami Vivekananda' থেকে তাঁর চিন্তাগুলি সুসংবদ্ধভাবে চয়ন করে রামকৃষ্ণ আশ্রম, মহীশূর, ১৯৯৯-এ 'Personality Development' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিল। পুস্তিকাটিতে একটি আলোকপ্রদ ভূমিকাও সংযুক্ত হইয়াছে, যাহার

জন্য আমরা লেখকের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। পুস্তিকাটির পুনর্মুদ্রণ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমাদের আশা, সাধক বিশেষত তরুণ প্রজন্মের যাঁরা ব্যক্তিত্ববিকাশে আগ্রহী, এই বই পড়ে তাঁরা খুবই উপকৃত হবেন

কলকাতা **প্রকাশক**

আগস্ট ২৩, ২০০১

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিঃস্বার্থপরতাই সাফল্য আনবে	৬৪
ভালবাসাই ফলদায়ী	৬৭
দুর্বলতাই মৃত্যু	৭০
সাহসী হও	৭৬
বীরত্ব	৭৮
আত্মবিশ্বাস	৮০
অনুকরণ ভালো নয়	৮২
নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি কি?	৮৪
আদর্শ ধরে থাকো	৮৭
একাগ্রতার শক্তি	৯১
সাম্যভাব বাড়াও	৯৬
মুক্ত হও	৯৮
এগিয়ে চলো	১০৩
তথ্যপঞ্জী	১০৫

ভূমিকা

ব্যক্তিত্ব কি?

কেমব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল ডিকশনারী অফ্ ইংলিশ-এর মতে, 'আপনি যে-ধরনের মানুষ, সেটিই আপনার ব্যক্তিত্ব এবং তাহাই আপনার আচরণ, অনুভূতি এবং চিন্তায় প্রকাশ পায়।' লংম্যান ডিকশনারী অফ্ কনটেম্পোরারি ইংলিশ বলিয়াছেন, ব্যক্তিত্ব হইল 'একটি ব্যক্তির সামগ্রিক প্রকৃতি অথবা চরিত্র।'

একজন মানুষের ব্যবহার কিরকম হইবে, তাঁহার অনুভূতি ও চিন্তা কি ধরনের হইবে, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে তিনি কিরকম আচরণ করিবেন—এইসব কিছুই তাঁহার মনের অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাহিরের রূপ, কথাবার্তা, অথবা বিদঘুটে অভ্যাস—এইগুলি নিছক বাহিরের জিনিস; প্রকৃত ব্যক্তিত্বকে তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। সত্যিকারের ব্যক্তিত্ববিকাশের মূল মানুষের সত্তার আরও গভীরে নিহিত। অতএব, আমাদের ব্যক্তিত্বকে বুঝিতে হইলে, মনের প্রকৃতিটি কি এবং কিভাবে তাহা কাজ করে, আগে সেইটি ভালোভাবে জানিতে হইবে।

আমাদের মনকে জানার প্রয়োজনীয়তা ঃ

আমরা অনেক কিছুই করিতে চাই এবং করিব বলিয়া

সঙ্কল্পও করি। যেমন প্রতিজ্ঞা করি—জীবনে ভালো অভ্যাস গড়িয়া তুলিব, বদভ্যাস যাহা আছে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিব, একাগ্রমনে পড়াশুনা করিব অথবা কোনও কিছু মন দিয়া করিব, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, আমাদের মন বাঁকিয়া বসে। ফলে পিছিয়া আসিতে হয়। যা করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি, তাহা আর করা হইয়া উঠে না। আমাদের সামনে হয়তো একখানি পুস্তক খোলা আছে, চক্ষুও খোলা। কিন্তু মন অন্যত্র ঘোরাঘুরি করিতেছে—হয় অতীতের কোন ঘটনার কথা চিন্তা করিতেছে, নতুবা ভবিষ্যতের কোনও পরিকল্পনায় মশগুল। আমরা যখন কয়েক মিনিট চুপচাপ বসিয়া প্রার্থনা করিতে চেষ্টা করি অথবা কোনও দেব-দেবীর নাম বা রূপ চিন্তা করিতে বসি, তখনও এই একই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন ঃ "মুক্ত! হায়, আমরা নিজেদের মনকে নিমেষের জন্য সংযত করিতে পারি না, বস্তু-বিশেষে উহাকে নিবদ্ধ রাখিতে পারি না, বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া মুহূর্তের জন্য একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিতে পারি না! অথচ আমরাই নিজেদের মুক্ত বলি। ব্যাপারটা চিন্তা করিয়া দেখ।"[১]

ভগবদ্গীতাকার বলিয়াছেন, অসংযত মনই আমাদের শত্রু। কিন্তু যে-মন সংযত, তা আমাদের বন্ধুর কাজ করিয়া থাকে।[২] অতএব, আমাদের মন কিভাবে কাজ করিয়া থাকে, সে সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। আমরা কি মনকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে পারি, যাহাতে সে আমাদের বশে

থাকে এবং আমাদের সহিত সহযোগিতা করে? আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহিত মনকে নিয়ন্ত্রণ করার সম্পর্কই বা কি?

মনের চতুর্বিধ ক্রিয়া ঃ

মানবমনের চারিটি প্রধান কর্ম। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টিকে বোঝানো যাইতে পারে। মনে করা যাক, এক ব্যক্তির সহিত আমার দেখা হইল যাঁহাকে আমি বছর দশেক আগে কোথাও দেখিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে করিতে চেষ্টা করিব, কখন এবং কোথায় তাঁহাকে দেখিয়াছি এবং তাঁহার পরিচয়টিই বা কি! মনের নিভৃত প্রদেশে অমনি তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ শুরু হইয়া গেল, সেইখানে ঐ ব্যক্তির সহিত সম্পর্কিত কোনও ঘটনার স্মৃতি সঞ্চিত আছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য। সহসা আমি তাঁহাকে অমুক ব্যক্তি বলিয়া চিনিতে পারিলাম এবং অবশেষে বলিলাম, 'অমুক জায়গায় ওঁর সহিত আমার দেখা হইয়াছিল' ইত্যাদি। এখন আমার ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত একটি জ্ঞান হইল।

দৃষ্টান্তটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিব মনের চারিটি কর্ম ঃ

স্মৃতি ঃ যেখানে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতাগুলি সূক্ষ্ম আকারে সঞ্চিত থাকে সেই স্মৃতির ভাণ্ডারটিকে 'চিত্ত' বলা হয়। ভালো, মন্দ যেসব চিন্তা বা কাজ আমরা করিয়া থাকি, সেসব কিছুরই ছাপ (impressions) সেখানে মজুত থাকে।

এই impressions-এর সমষ্টিই আমাদের চরিত্র নির্ধারণ করিয়া থাকে। এই যে 'চিত্ত', তাহাকে আবার অবচেতন মনও বলা হয়।

বিচার ও ভাবনা ঃ

অনিশ্চিত মনের সম্মুখে পছন্দ-অপছন্দের নানা বিকল্প বিষয় হাজির হয় এবং মন তাহা বিচার করিয়া দেখে। মনের এই যে বিচারক্ষমতা, তাহাকে 'মনস্' বলা হয়। কল্পনা ও ধারণা শক্তি—সেও এই 'মনস্'-এর কাজ।

নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত-গ্রহণ ঃ

বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। বুদ্ধি হইল মনের সেই ক্ষমতা যাহার দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হয়। কোনও বিষয়ের খুঁটিনাটি বিচার করিবার পর 'বুদ্ধি' বলিয়া দেয় কোন্‌টি অধিক কাম্য। বুদ্ধি হইল ব্যক্তির সেই ক্ষমতা, যাহার দ্বারা সে সত্য ও মিথ্যা, নিত্য ও অনিত্য, কোন্‌টি করণীয় এবং কোন্‌টি বর্জনীয়, কোন্‌টি নৈতিক দিক দিয়া ঠিক এবং কোন্‌টি ভুল, তা বিচার করিবার শক্তি দেয়। এইটি আমাদের ইচ্ছাশক্তিরও আধার, যে-ইচ্ছাশক্তি ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। সেই কারণেই মনের এই দিকটির প্রতি আমাদের সর্বাধিক দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

'আমি'-র চেতনা ঃ

আমরা বলিয়া থাকি 'আমি খাচ্ছি', 'আমি দেখছি', 'আমি

বলছি', 'আমি শুনছি', আমি ভাবছি', 'আমি বিভ্রান্ত' ইত্যাদি। এই যে দিনরাত 'আমি', 'আমি' করিয়া সবরকম দৈহিক ও মানসিক কাজ কর্ম নিজের উপর আরোপ করা, এইটির নামই 'অহংকার' অথবা আমিত্ববোধ। যতক্ষণ এই 'আমি' নিজেকে অসংযত দেহ ও মনের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া থাকে, ততক্ষণই মানুষ জীবনের জাগতিক ঘটনা ও পরিস্থিতির দাস; তাদের দ্বারাই সে নিয়ন্ত্রিত হয়। আনন্দদায়ক ঘটনা ঘটিলে তখন আমরা সুখী, কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতি আসিলেই দুঃখে ভাঙিয়া পড়ি। মন যতই সূক্ষ্ম ও সংযত হয়, ততই আমরা বুঝিতে পারি আমিত্ব বোধের প্রকৃত উৎসটি কি। এবং সেই অনুপাতে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আরও বেশি সুশৃঙ্খল ও নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারি। এমন ব্যক্তি কোনও মতেই আর কোনও ঘটনা বা অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হন না।

মনস্, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার, মনের এই যে চারিটি দিক বা পর্যায়, এগুলি কিন্তু পৃথক পৃথক বস্তু নয়; একই মন, শুধু কাজের পার্থক্যের জন্য আলাদা আলাদা নামে ডাকা হয়, এই যা।

মন প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা ঃ

মানুষের ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দিতে গিয়া কঠোপনিষদ্[৩] একটি রথের উপমা দিয়াছেন। আমাদের প্রকৃত যে 'আমি', তাঁহাকে রথী বলা হইয়াছে; তিনিই রথের প্রভু। দেহ হইল রথ এবং বুদ্ধি সারথি। মন হইল লাগাম যাহার সহিত বাঁধা আছে চক্ষু,

কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক—এই পাঁচটি অশ্বরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়। মানুষের এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় যেন পাঁচটি জানালা যাহার মধ্য দিয়া আমরা বাহ্য পৃথিবীর নানা বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলি যেন পথ, যাহার উপর দিয়া দেহ-রথ চলে। যে মানুষ এই দেহ-মন ব্যাপারের সহিত একাত্ম বোধ করে, বলা হয়, সেই বিষয়ের ভোক্তা, অর্থাৎ সে বিষয় ভোগ করে। ফলে তাকে কর্মফলও ভোগ করিতে হয়।

ঘোড়াগুলিকে যদি সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারা যায় এবং সারথি যদি নিদ্রিত থাকে, তাহা হইলে রথ তাহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইতে পারিবে না। শুধু তাহাই নয়, রথটি উল্টাইয়া গিয়া আরোহীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। অনুরূপভাবে, ইন্দ্রিয়গুলিকে যদি বশে না আনা যায় এবং বিচারের ক্ষমতা যদি নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে মানুষ তাহার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারে না। অন্যদিকে, ঘোড়াগুলি যদি নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং সারথি সজাগ থাকে, তবে রথটি যেমন তাহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া যায়, তেমনিভাবে বুদ্ধি যদি জাগ্রত থাকে এবং মনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিও সংযত ও আয়ত্তে থাকে তবে মানুষও তাহার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া কৃতকৃত্য হইতে পারে। কিন্তু জীবনের সেই লক্ষ্যটি কি? সেই প্রসঙ্গে আমরা পরে আসিতেছি।

মনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া যাহার সহিত ব্যক্তিত্ব বিকাশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, সেইটি হইল আমাদের

আবেগ। আবেগকে আমরা যতই নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারিব আমাদের ব্যক্তিত্ব ততই পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইবে। আবেগকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; যথা—আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। ভালবাসা, প্রশংসা, আকাঙ্ক্ষা, সহানুভূতি, আনন্দ, শ্রদ্ধা, গর্ব, ইত্যাদি এগুলি সব আকর্ষণ পর্যায়ভুক্ত। এবং ঘৃণা, ক্রোধ, ভয়, দুঃখ, পরশ্রীকাতরতা, বিরক্তি, লজ্জা, অপমান, এগুলি বিকর্ষণ পর্যায়ে পড়ে। যতদিন আমরা বিশৃঙ্খল মনের সঙ্গে নিজেদের জড়াইয়া রাখি ততদিন আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রকৃত বিকাশ হইবে না। বুদ্ধি বা সারথিই হইল আত্মবিকাশের প্রকৃষ্ট মাধ্যম যা আবেগকে বশে আনিয়া অশুদ্ধ মনের হস্ত হইতে আমাদের উদ্ধার করে, শুদ্ধ সত্তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

চরিত্র কি?

আমরা যে কর্মই করি না কেন, যে চিন্তাই করি না কেন, তার সবকিছুই আমাদের মনে একটি ছাপ রাখিয়া যায়। কোন্ মুহূর্তে আমরা কিরকম আচরণ করিব বা কোনও এক পরিস্থিতিতে আমরা কিভাবে সাড়া দিব—তা এই impression-গুলিই ঠিক করিয়া দেয়। এই সংস্কার বা impression-গুলির যোগফলই আমাদের চরিত্র নির্ধারণ করে। অতীত গড়িয়া তুলিতেছে বর্তমানকে। ঠিক তেমনইভাবে বর্তমানও—বর্তমান ভাবনাচিন্তা ও কাজকর্মগুলি—আমাদের ভবিষ্যত গড়িয়া তুলিবে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে এটি একটি মূল সূত্র বা নীতি।

শরীর ও মনকে কে চালিত করে?

ইহা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যাহার উত্তর খুঁজিয়া পাইলে নিজেদের সম্পর্কে আমাদের বর্তমান যে ধারণা, তাহার আমূল বদলাইয়া যাইবে। আমাদের দেশের মুনিঋষিরা অতীতে এই প্রশ্নটি লইয়া গভীর চিন্তা করিয়াছেন এবং তাঁহারা ইন্দ্রিয় মন লইয়া বিস্তর পরীক্ষানিরীক্ষা চালাইয়াছেন। সুনির্দিষ্ট পথে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, মানুষের একটি দিব্যরূপ বা সত্তা আছে যাহাকে চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ এবং বাক্যের বাক্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৪] এই দিব্যসত্তাই আমাদের প্রকৃত 'আমি' এবং আমাদের ব্যক্তিত্বের চিরন্তন অঙ্গ। শরীর বিনষ্ট হইলেও এই দিব্যসত্তা নষ্ট হয় না—তাহা অটুট থাকে। যতদিন আমরা শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে একাত্ম বোধ করি ততদিন এই দিব্যসত্তা আমাদেরই মধ্যে ঘুমাইয়া থাকে। শাস্ত্র এবং মহাপুরুষেরা বলিয়াছেন, এই সুপ্ত দিব্যসত্তাকে প্রকাশ করাই জীবনের লক্ষ্য।

স্বামী বিবেকানন্দের মূল বাণীটি কি?

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা, কথাবার্তা, চিঠিপত্র, কবিতা—তাঁহার সব কিছুই 'The Complete Works of Swami Vivekananda'-র নয়টি* খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এই নয়টি খণ্ডে স্বামীজীর কি কোনও মূল বাণী আছে? দেখা যাক, স্বামীজী নিজে এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন। স্বামীজী বলিয়াছেন ঃ

* বাংলায় বাণী ও রচনা দশ খণ্ডে প্রকাশিত—ইংরাজি নবম খণ্ড বাংলায় এখনও প্রকাশিত হয়নি।

"আমার আদর্শকে বস্তুত অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তাহা এই : মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।"[৫] মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বই ছিল স্বামীজীর প্রধান বাণী। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করা যাইতে পারে যাহা ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের মূলমন্ত্র হওয়ার উপযুক্ত। বাণীটিতে স্বামীজী বলিয়াছেন : "আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।"[৬]

মানুষকে তার অন্তর্নিহিত দেবত্ব সম্বন্ধে সচেতন করানোর ব্যাপারে স্বামীজীর কোনও ক্লান্তি ছিল না। তিনি চাহিয়াছিলেন এই দেবত্ব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ফুটিয়া উঠুক। বস্তুত দেবত্বের এই প্রকাশকেই তিনি মানবসভ্যতার উৎকর্ষ নির্ধারণের প্রধান মানদণ্ড হিসাবে খাড়া করিয়াছিলেন। স্বামীজী বলিয়াছেন : "কোন জাতি জলে স্থলে এমনকি সমস্ত পঞ্চভূতের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারে এবং জীবনের উপযোগিতা-বিষয়ক সমস্যাগুলির আপাত-সমাধান করিতে পারে, তথাপি সভ্যতা ব্যক্তি-জীবনের বাস্তব হইয়া উঠে না। যে আপন আত্মাকে জয় করিতে পারিয়াছে, সভ্যতার পরাকাষ্ঠা তাহারই মধ্যে পরিস্ফুট।"[৭]

"এই জগৎটা যেন একটা ব্যায়ামাগার। জীবাত্মা এখানে নানান কসরৎ করিয়া নিজেকে ক্রমশ দেবত্বে উন্নীত করিতেছে। অতএব সবকিছুর মূল্যই নির্ধারিত হইবে তাহার ভিতর কতটা দেবত্বের প্রকাশ হইয়াছে, তাহার উপর। মানুষের মধ্যে সেই দেবত্বের প্রকাশকেই সভ্যতা বলে।"[৮]

আমাদের এই দেবত্বই অনন্ত অস্তিত্ব, অনন্ত জ্ঞান এবং অনন্ত আনন্দের ভাণ্ডার। এই দেবত্ব যত বিকশিত এবং প্রকাশিত হইতে থাকে, ততই আমরা শাশ্বত সুখ অনুভব করি এবং পরম জ্ঞান আমাদের করায়ত্ত হয়।

ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রাণবস্তু ঃ

আমাদের ব্যক্তিত্বের দিব্য কোরকটি যেন পাঁচটি আবরণে ঢাকা।

• দৈহিক আবরণ (Physical dimension), যা আমাদের দেহ এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ে গঠিত।

• প্রাণময় আবরণ (Energy dimension), যা আমাদের খাদ্য পরিপাকক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং অন্যান্য দৈহিক ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে।

• মনোময় আবরণ (Mental dimension), যা চিন্তা, অনুভব এবং আবেগের মতো মানসিক কাজগুলি করে।

• বিজ্ঞানময় আবরণ (Intellectual dimension), যার বৈশিষ্ট্য কোনও কিছু নিশ্চয়ভাবে নির্ধারণ করা। মানুষের এই

ক্ষমতা আছে। এই আবরণটি আবার বিচারশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তিরও আশ্রয়।

• আনন্দময় আবরণ (Blissful dimension), যে অবস্থাটি স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার সময় অনুভূত হয়।

এই যে পাঁচটি আবরণ যাহা আমাদের দিব্য স্বরূপকে পর্যায়ক্রমে ঢেকে রেখেছে, তা একটি অন্যটির চেয়ে সূক্ষ্ম। স্থূলতম আবরণটি দৈহিক। তার চেয়ে সূক্ষ্ম প্রাণময়। মনোময় সূক্ষ্মতর। তার চেয়েও সূক্ষ্ম বিজ্ঞানময়। সবশেষে, সূক্ষ্মতম হইল আনন্দময় আবরণটি।

ব্যক্তিত্ব বিকাশ বলিতে বোঝায় ক্রমশ ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্মতর আবরণ বা দিকটির সহিত নিজের অভিন্নতা অনুভব করা। সেই কারণেই কেউ যদি উচ্চতর মানসিক ক্ষমতাগুলির সদ্ব্যবহার না করিয়া শুধু দৈহিক দিকটির সহিত একাত্মতা বোধ করেন, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, তিনি পশুর জীবনই যাপন করিয়াছেন কারণ পশুর আনন্দ ও বেদনা কেবল শরীরেই সীমাবদ্ধ।

উন্নতি করিতে গেলে সংগ্রাম করিতেই হইবে। আর এই সংগ্রাম নিজেরই অপরিণত মনের সহিত, যে-মন বাসনা, পুরনো অভ্যাস, অসৎ প্রবণতা, আবেগ ও কু-প্রভাবে মলিন হইয়া আছে। যতই আমরা এই কাঁচা মনের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া মনের উচ্চ হইতে উচ্চতর দিকগুলির সহিত নিজেদের একত্ববোধ করিব এবং বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করিয়া চলিব,

ততই আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইবে। কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন মনের সহিত লড়াই করা, পুরনো অভ্যাসগুলির সহিত যুদ্ধ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন, ভালো অভ্যাস গড়িয়া তোলা। যতরকমের সংগ্রাম আছে তাহার মধ্যে এই সংগ্রামই সব থেকে কঠিন। এই সংগ্রামই মহত্তম কারণ এটিই আমাদের প্রচ্ছন্ন পূর্ণতা এবং দেবত্বকে প্রকাশ করিয়া আমাদের সর্বার্থেই সুসভ্য করিয়া তোলে।

ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কয়েকটি অত্যাবশ্যক গুণ ঃ

নিজের প্রতি বিশ্বাস ঃ স্বামীজী বলিয়াছেন, ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করিতে হইলে নিজের দিব্যস্বরূপের প্রতি জ্বলন্ত বিশ্বাস থাকিতে হইবে। এই আত্মশ্রদ্ধাই প্রধান সহায়। আগে নিজের প্রতি বিশ্বাস, তারপর ভগবানে বিশ্বাস। কেহ যদি বিশ্বাস করেন, স্বরূপতঃ তিনি দেহ নন, মনও নন, তিনি আত্মা, তাহা হইলে তিনি আর পাঁচজনের চাইতে অনেক বড়মাপের মানুষ হইবেন, চরিত্রবান হইবেন।

ইতিবাচক চিন্তা ঃ

মানুষের দুর্বলতাকে স্বামীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। উন্নতচরিত্রের মানুষ হইতে হইলে গঠনমূলক, ইতিবাচক শুভচিন্তা একান্ত প্রয়োজন এবং তা তখনই আসে যখন আমরা আমাদের প্রচ্ছন্ন দেবত্বে বিশ্বাস রাখি। স্বামীজী বলিয়াছেন, "কেবল সৎকার্য করিয়া যাও, অবিরতভাবে পবিত্র চিন্তা কর; অসৎ সংস্কার-নিবারণের ইহাই একমাত্র উপায়।

...চরিত্র কেবল পুনঃপুনঃ অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। পুনঃপুনঃ অভ্যাসই চরিত্র সংশোধন করিতে পারে।"[৯] স্বামীজী আরও বলিয়াছেন, একমাত্র পাপ হইল নিজেকে এবং অন্যদের দুর্বল ভাবা।

ব্যর্থতা ও ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

স্বামীজীর মত হইল, হাজারবার ব্যর্থ হইলেও আদর্শকে ধরিয়া থাকা চাই। ভুলত্রুটি হওয়াই স্বাভাবিক। দেওয়াল তো মিথ্যা বলে না, কিন্তু ঐ রকম জড়, নির্জীব অস্তিত্বের পরিবর্তে আদর্শকে ধরিয়া থাকিতে গিয়া ভুল হওয়াও ভাল, কারণ ভুল-ত্রুটির মাধ্যমেও আমাদের শিক্ষা হয়।

আত্ম-নির্ভরতা ঃ

মানুষ নিজেই তাহার ভাগ্য তৈয়ারি করে। স্বামীজী বলিয়াছেন, "বর্তমান অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী এবং আমরা যাহা হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইবার শক্তিও আমাদের আছে।"[১০]

ত্যাগ ও সেবা ঃ

স্বামীজী দেখাইয়াছেন, নিঃস্বার্থ সেবাই চারিত্রিক উন্নতির সর্বশ্রেষ্ঠ সোপান। ইহার সহিত তিনি জুড়িয়া দিয়াছেন ত্যাগ—স্বার্থপরতা বিসর্জন এবং কর্মফলে অনাসক্তি। এই সেবা ও ত্যাগই আমাদের জাতীয় আদর্শ। তাঁর মতে, জাতিকে ঐ আদর্শের পথে পরিচালিত করিলেই বাকি সব আপনা হইতেই হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, "ঐ দুইটি বিষয় উন্নত

করুন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যাহা কিছু আপনা হইতে উন্নত হইবে।"[১১]

এই পুস্তিকা সম্পর্কে ঃ

এই পুস্তিকা ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্পর্কে স্বামীজীর চিন্তাভাবনাগুলি যুবসমাজকে অবহিত করানোর এক সামান্য প্রচেষ্টামাত্র। আমাদের আশা, এই পুস্তিকাটি যুবক-যুবতীদের স্বামীজীর রচনাবলী পড়িতে উদ্বুদ্ধ করিবে, চরিত্র গঠন করিয়া নিজেদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রেরণা দিবে। উন্নত চরিত্রের মানুষ হইলে এবং ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইলে তাঁরা নিজের কর্মক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য দেখাইতে পারিবেন। তাহা হইলে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত উন্নতি এবং জাতির অগ্রগতি—দুইটিই সম্ভব হইবে। স্বামীজীর আহ্বান ঃ "তোমরা নিজ নিজ স্বরূপের চিন্তা কর এবং সর্বসাধারণকে ঐ শিক্ষা দাও। ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূত জীবাত্মার নিদ্রাভঙ্গ কর। আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে শক্তি আসিবে, মহিমা আসিবে, সাধুত্ব আসিবে, পবিত্রতা আসিবে—যা কিছু ভাল সকলই আসিবে।"[১২]

ব্যক্তিত্বই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ

আমরা এমন মানুষ দেখিতে চাই, যিনি সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছেন...উদারহৃদয়, উন্নতমনা (কর্মে নিপুণ)।... প্রয়োজন এইরূপ ব্যক্তির, যাঁহার অন্তঃকরণ জগতের দুঃখ-কষ্ট তীব্রভাবে অনুভব করে।...আর (আমরা চাই) এমন মানুষ, যিনি যে শুধু অনুভব করিতে পারেন তাহা নয়, পরন্তু বস্তুনিচয়ের অর্থ ধরিতে পারেন, যিনি প্রকৃতি এবং বুদ্ধির মর্মস্থলে গভীরভাবে ডুব দেন। (আমাদের দরকার) এমন মানুষের, যিনি সেখানেও থামেন না, (কিন্তু) যিনি (সেই অনুভবকে বাস্তব কর্মে) রূপায়িত করিতে ইচ্ছুক। মস্তিষ্ক, হৃদয় এবং হাত—এই তিনটির এই প্রকার সমন্বয় আমাদের কাম্য।[১]

আমাদের চারিদিকে কি ঘটিতেছে—দেখ না। জগৎ জুড়িয়া যেন একটা প্রভাবপ্রসারের ব্যাপার চলিতেছে। নিজ শরীর-রক্ষার কাজে আমাদের শক্তির একটা অংশ ব্যয়িত হয়, বাকি শক্তির প্রতিটি বিন্দুই দিনরাত ব্যয়িত হইতেছে অপরকে প্রভাবান্বিত করার কাজে। আমাদের শরীর, আমাদের গুণ, আমাদের বুদ্ধি এবং আমাদের আধ্যাত্মিকতা—এ-সবই সর্বক্ষণ অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। অপর দিকে আবার ঠিক এইভাবেই আমরাও অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইতেছি। আমাদের চারিদিকেই এই কাণ্ড ঘটিতেছে। একটি

স্থূল উদাহরণ দিতেছি। কেহ হয়তো আসিলেন, যাঁহাকে তুমি সুপণ্ডিত বলিয়া জান এবং যাঁহার ভাষা মনোরম; ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলিলেন। কিন্তু তিনি তোমার মনে কোন রেখাপাত করিতে পারিলেন না। আর একজন আসিয়া কয়েকটি মাত্র কথা বলিলেন, তাও সুসংবদ্ধ ভাষায় নয়, হয়তো বা ব্যাকরণের ভুলও রহিয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি তোমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিলেন। তোমরা অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছ। কাজেই বেশ বোঝা যাইতেছে যে, শুধু কথা সব সময় মনে দাগ কাটিতে পারে না; লোকের মনে ছাপ দিবার কাজে ভাষা—এমন-কি চিন্তা পর্যন্ত কাজ করে তিনভাগের একভাগ মাত্র, বাকি দুইভাগ কাজ করে ব্যক্তিটি। ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই বাহিরে গিয়া তোমাকে প্রভাবিত করে।

আমাদের সব পরিবারেই একজন কর্তা আছেন; দেখা যায়—তাঁহাদের ভিতর কয়েকজন এ কাজে সফলকাম হন, কয়েকজন হন না। কেন? আমাদের বিফলতার জন্য আমরা দোষ চাপাই পরিবারের অন্য লোকদের উপর। অকৃতকার্য হইলেই বলি, এই অমুকের দোষে এইরূপ হইল। বিফলতার সময় নিজের দোষ বা দুর্বলতা কেহ স্বীকার করিতে চায় না। নিজেকে নির্দোষ দেখাইতে চায় সকলেই, আর দোষ চাপায় অপর কাহারও বা অপর কিছুর ঘাড়ে, নয়তো দুর্ভাগ্যের ঘাড়ে। গৃহকর্তারা যখন অকৃতকার্য হন, তখন তাঁহাদের

নিজেদের মনেই প্রশ্ন তোলা উচিত যে, কেহ কেহ তো বেশ ভালভাবেই সংসার চালায়, আবার কেহ কেহ তাহা পারে না কেন? দেখা যাইবে যে, সব নির্ভর করিতেছে ব্যক্তিটির উপর; পার্থক্য সৃষ্টির কারণ হয় লোকটি নিজে, তাহার উপস্থিতি বা তাহার ব্যক্তিত্ব।

মানবজাতির বড় বড় নেতাদের কথা ভাবিতে গেলে আমরা সর্বদা দেখিব, নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের জন্যই তাঁহারা নেতা হইতে পারিয়াছিলেন। অতীতের বড় বড় সব গ্রন্থকারদের, বড়বড় সব চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কথা ধর। খাঁটি কথা বলিতে গেলে কয়টি চিন্তাই বা তাঁহারা করিয়াছেন? মানবজাতির পুরাতন নেতারা যাহা কিছু লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সবটার কথাই ভাব; তাঁহাদের প্রত্যেকখানি পুস্তক লইয়া উহার মূল্য নির্ধারণ কর। জগতে আজ পর্যন্ত যেসব যথার্থ চিন্তার, নূতন ও খাঁটি চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে, সেগুলির পরিমাণ মুষ্টিমেয়। আমাদের জন্য যেসব চিন্তা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি পড়িয়া দেখ। গ্রন্থকারেরা যে মহামানব ছিলেন, তাহা তো মনে হয় না, অথচ জীবৎকালে তাঁহারা যে মহামানবই ছিলেন, তাহা সুবিদিত। তাঁহারা এত বড় হইয়াছিলেন কিভাবে? শুধু তাঁহাদের চিন্তা, তাঁহাদের লেখা গ্রন্থ বা তাঁহাদের বক্তৃতার জন্য তাঁহারা বড় হন নাই; এসব ছাড়া আরও কিছু ছিল, যাহা এখন আর নাই; সেটি তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব। আগেই বলিয়াছি, এ ব্যাপারে

মানুষটির ব্যক্তিত্বের প্রভাব তিনভাগের দুইভাগ, আর তাঁহার বুদ্ধির, তাঁহার ভাষার প্রভাব তিনভাগের একভাগ। প্রত্যেকের ভিতরই আমাদের আসল মানুষটি, আসল ব্যক্তিত্বটি প্রকৃত কাজ করে; আমাদের ক্রিয়াগুলি তো শুধু উহার বহিঃপ্রকাশ। মানুষটি থাকিলে কাজ হইবেই; কার্য কারণকে অনুসরণ করিতে বাধ্য।

সর্ববিধ জ্ঞানদানের, সর্ববিধ শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত ভিতরের মানুষটিকে গড়িয়া তোলা। কিন্তু তাহার বদলে আমরা সব সময় বাহিরটি মাজিয়া-ঘষিয়া চাকচিক্যময় করিতেই ব্যস্ত। ভিতর বলিয়া যদি কিছু না-ই রহিল, তবে শুধু বাহিরের চাকচিক্য বাড়াইয়া লাভ কি? মানুষকে উন্নত করাই সর্ববিধ শিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। যে-ব্যক্তি অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, তিনি সমজাতীয় ব্যক্তিদের উপর যেন যাদুমন্ত্র ছড়াইতে পারেন, তিনি যেন শক্তির একটা আধার-বিশেষ। ঐরূপ মানুষ তৈরি হইয়া গেলে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ হন; এরূপ ব্যক্তিত্ব যে বিষয়ে নিয়োজিত হইবে, তাহাই সফল করিয়া তুলিবে।[২]

ব্যক্তিত্ব বিকাশের সূত্রাবলী

যোগ-বিজ্ঞান দাবি করে যে, এই ব্যক্তিত্বকে ক্রমবর্ধিত করিবার প্রক্রিয়া সে আবিষ্কার করিয়াছে; সেসব রীতি ও প্রক্রিয়া যথাযথভাবে মানিয়া চলিলে প্রত্যেকেই নিজ ব্যক্তিত্বকে বাড়াইয়া অধিকতর শক্তিশালী করিতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক বিষয়গুলির মধ্যে ইহা অন্যতম, এবং সর্ববিধ শিক্ষার রহস্যও ইহাই। সকলেরই পক্ষে ইহা প্রযোজ্য। গৃহস্থের জীবনে, ধনী, দরিদ্র, ব্যবসায়ীর জীবনে, আধ্যাত্মিক জীবনে, সকলেরই জীবনে এই ব্যক্তিত্বকে বাড়াইয়া তোলার মূল্য অনেক। প্রাকৃতিক যেসব নিয়ম আমাদের জানা আছে, সেগুলিরও পিছনে অতি সূক্ষ্ম সব নিয়ম রহিয়াছে। অর্থাৎ স্থূলজগতের সত্তা, মনোজগতের সত্তা, অধ্যাত্মজগতের সত্তা প্রভৃতি বলিয়া আলাদা আলাদা কোন সত্তা নাই। সত্তা বলিতে যাহা আছে, তাহা একটি-ই। বলা যায়, ইহা যেন একটি ক্রমসূক্ষ্ম অস্তিত্ব; ইহার স্থূলতম অংশটি এখানে রহিয়াছে; (একবিন্দু অভিমুখে) এটি যতই সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া চলিয়াছে; আমরা যাহাকে 'আত্মা' বলি, তাহাই সূক্ষ্মতম, আমাদের দেহ স্থূলতম। আর মনুষ্যরূপ এই ক্ষুদ্র জগতেও যাহা আছে, ব্রহ্মাণ্ডেও ঠিক তাহাই আছে।

আমাদের এই বিশ্বটিও ঠিক এইরূপই, জগৎ তাহার স্থূলতম বাহ্যপ্রকাশ, আর ক্রমশ একবিন্দু-অভিমুখী হইয়া চলিয়া তাহা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর হইতে হইতে শেষে ঈশ্বরে পর্যবসিত হইয়াছে।

তাহা ছাড়া আমরা জানি যে, সূক্ষ্মের মধ্যেই প্রচণ্ডতম শক্তি নিহিত থাকে; স্থূলের মধ্যে নয়। কোন লোককে হয়তো বিপুল ভার উত্তোলন করিতে দেখা যায়; তখন তাহার মাংসপেশীগুলি ফুলিয়া উঠে, তাহার সারা অঙ্গে শ্রমের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়। এসব দেখিয়া আমরা ভাবি, মাংসপেশীর কি শক্তি! কিন্তু মাংসপেশীতে শক্তি যোগায় সুতার মতো সরু স্নায়ুগুলিই; মাংসপেশীর সঙ্গে একটিমাত্র স্নায়ুরও সংযোগ ছিন্ন হইবামাত্র মাংসপেশী কোন কাজই আর করিতে পারে না। এই ক্ষুদ্র স্নায়ুগুলি আবার শক্তি আহরণ করে আরও সূক্ষ্ম বস্তু হইতে, সেই সূক্ষ্ম বস্তুটি আবার শক্তি পায় চিন্তা-নামক সূক্ষ্মতর বস্তুর নিকট হইতে; ক্রমে আরও সূক্ষ্ম, আরও সূক্ষ্ম আসিয়া পড়ে। কাজেই সূক্ষ্মই শক্তির যথার্থ আধার। অবশ্য স্থূল স্তরের গতিগুলিই আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু সূক্ষ্ম স্তরে যে গতি হয়, তাহা দেখিতে পাই না। যখন কোন স্থূল বস্তু নড়ে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি, সেজন্য স্বভাবতই গতির সঙ্গে স্থূলের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য মনে করি। কিন্তু সব শক্তিরই যথার্থ আধার সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মে কোন গতি আমরা দেখি না, সে গতি অতি তীব্র বলিয়াই বোধ হয়, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু কোন বিজ্ঞানের সহায়তায়, কোন গবেষণার সহায়তায় যদি বাহ্যপ্রকাশের কারণ-রূপ শক্তিগুলি

ধরিতে পারি, তাহা হইলে শক্তির প্রকাশগুলিও আমাদের আয়ত্তে আসিবে। কোন হ্রদের তলদেশ হইতে একটি বুদ্বুদ উঠিতেছে; যখন হ্রদের উপরে উঠিয়া উহা ফাটিয়া যায়, তখনই মাত্র উহা আমাদের নজরে পড়ে, তলদেশ হইতে উপরে উঠিয়া আসিবার মধ্যে কোন সময়ই সেটিকে দেখিতে পাই না। চিন্তার বেলাও চিন্তাটি অনেকখানি পরিণতি লাভ করিবার পর বা কর্মে পরিণত হইবার পর উহা আমাদের অনুভবে আসে। আমরা ক্রমাগত অভিযোগ করি যে, আমাদের চিন্তা—আমাদের কর্ম আমাদের বশে থাকে না। কিন্তু থাকিবে কি করিয়া? যদি সূক্ষ্মগতিগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, চিন্তারূপে কর্মরূপে পরিণত হইবার পূর্বেই যদি চিন্তাকে আরও সূক্ষ্মাবস্থায় তাহার মূলাবস্থায় ধরিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের পক্ষে সবটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এখন এমন কোন প্রক্রিয়া যদি থাকে, যাহা অবলম্বনে এই-সব সূক্ষ্মশক্তি ও সূক্ষ্ম কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করা, অনুসন্ধান করা, ধারণা করা এবং পরিশেষে এগুলিকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়, শুধু তাহা হইলেই আমরা নিজেকে নিজের বশে আনিতে পারিব। আর নিজের মনকে যে বশে আনিতে পারে, অপরাপর ব্যক্তির মনও তাহার বশে আসিবে নিশ্চিত। এইজন্যই সর্বকালে পবিত্রতা ও নীতিপরায়ণতা ধর্মের অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে। পবিত্র ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি নিজেকে নিজের বশে রাখিতে পারে। সব মন একই মনের বিভিন্ন অংশ মাত্র। একটি মৃৎখণ্ডের জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহার নিকট বিশ্বের সমুদয় মৃত্তিকাই জানা

হইয়া গিয়াছে। নিজের মন সম্বন্ধে জ্ঞান যাহার হইয়াছে, নিজের মনকে যে আয়ত্তে আনিয়াছে, সব মনের রহস্যই সে জানে, সব মনের উপরই তাহার প্রভাব আছে।

এখন সূক্ষ্মাংশগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে আমরা বহু শারীরিক দুর্ভোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি; সেইরূপ সূক্ষ্মগতিগুলি আয়ত্তে আনিতে পারিলে আমরা বহু দুর্ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি; এ সব সূক্ষ্মশক্তি নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতালাভ করিলে বহু বিফলতা এড়াইয়া চলা যায়।[১]

ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন স্তর

মানুষের এই স্থূল অংশ, যাহাতে বহিরিন্দ্রিয়সমূহ অবস্থিত, তাহাকে বলে 'স্থূলদেহ' বা 'স্থূলশরীর'। তারপর আসে প্রথমে ইন্দ্রিয়, তারপর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। এইসব এবং প্রাণশক্তিসমূহ মিলিয়া যে যৌগিক সত্তা গড়িয়া ওঠে, তাহাকে বলে 'সূক্ষ্মদেহ' বা 'সূক্ষ্মশরীর'। এই শক্তিসমূহ কতকগুলি সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত; সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে, স্থূলদেহের কোন ক্ষতিই সেগুলিকে ধ্বংস করিতে পারে না; দেহের সর্বপ্রকার আঘাত অতিক্রম করিয়া সেগুলি বাঁচিয়া থাকে। যে স্থূলশরীর আমরা দেখিতে পাই, তাহা স্থূল পদার্থ দিয়া গঠিত, কাজেই তাহা নিত্য নূতন হইতেছে, নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয়সমূহ—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সূক্ষ্মতম পদার্থ দ্বারা গঠিত, কাজেই যুগ যুগ ধরিয়া তাহারা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে, কোন কিছুর দ্বারা তাহাদের বাধা দেওয়া যায় না; যে কোন বাধা তাহারা অতিক্রম করিতে পারে। স্থূলদেহ যেমন অচেতন, সূক্ষ্মদেহও তাই, কারণ তাহা সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত। যদিও তাহার এক অংশকে 'মন', অপর অংশকে 'বুদ্ধি' এবং তৃতীয় অংশকে বলে 'অহঙ্কার', তথাপি একনিমেষেই আমরা বুঝিতে পারি যে, উহাদের কোনটিই

'জ্ঞাতা' হইতে পারে না—অনুভবের কর্তা হইতে পারে না; সর্বকর্মের সাক্ষী বা সর্বকর্মের লক্ষ্যও হইতে পারে না। মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কারের সকল কর্মই এতদতিরিক্ত কাহারও জন্য হইতে বাধ্য। এই সবকিছুই সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত বলিয়া কখনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। এগুলির দীপ্তি নিজেদের ভিতরে থাকিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এই টেবিলটির প্রকাশ কোন বাহ্যবস্তুর জন্য হইতে পারে না। সুতরাং উহাদের সকলের পশ্চাতে নিশ্চয় এমন একজন আছেন, যিনি প্রকৃত প্রকাশক, প্রকৃত দ্রষ্টা, প্রকৃত ভোক্তা; সংস্কৃতে তাঁহাকেই বলা হয় 'আত্মা'—মানুষের আত্মা, মানুষের প্রকৃত স্বরূপ।[১]

শরীর প্রতি মুহূর্তে মরিতেছে, মন নিয়ত পরিবর্তনশীল। শরীর একটি যৌগিক পদার্থ, মনও তাই; অতএব তাহারা কখনও পরিবর্তনশীলতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না। কিন্তু এই স্থূল জড়বস্তুর ক্ষণিক আবরণের ঊর্ধ্বে, এমন কি মনের সূক্ষ্মতর আবরণেরও ঊর্ধ্বে, সেই আত্মা বিরাজমান, যাহা মানুষের প্রকৃত সত্তা, যাহা চিরস্থায়ী ও চিরমুক্ত। তাহারই মুক্ত স্বভাব মানুষের চিন্তা ও বস্তুর স্তরের মধ্য দিয়া অনুস্রুত (প্রকাশিত) হইতেছে এবং নামরূপে রঞ্জিত হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় বন্ধনহীন অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। অজ্ঞানের ঘনীভূত স্তরের আবরণ সত্ত্বেও তাঁহারই অমরত্ব, তাঁহারই পরমানন্দ, তাঁহারই শান্তি, তাঁহারই ঐশ্বর্য উদ্ভাসিত হইয়া স্বীয় অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। এই ভয়শূন্য, মৃত্যুহীন, মুক্ত আত্মাই প্রকৃত মানুষ।

যখন কোন বহিঃশক্তি কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, কোনও পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না, তখনই স্বাধীনতা বা মুক্তি সম্ভব। মুক্তি শুধু তাহারই পক্ষে সম্ভব, যে সর্বপ্রকার বন্ধনের—সমস্ত নিয়মের এবং কার্য-কারণের নিয়ন্ত্রণের অতীত। অর্থাৎ অন্য প্রকারে বলিতে গেলে বলা যায়—যে অবিকারী, সেই শুধু মুক্ত এবং সেইজন্যই সে অমর হইতে পারে। মুক্ত অবিকারী ও বন্ধনহীন—এই যে জীবাত্মা, এই যে মানবাত্মা, ইহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ; ইহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই।[২]

প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিত্বকে একটি কাঁচের গোলকের সঙ্গে তুলনা করিতে পারা যায়। প্রত্যেকটির কেন্দ্রে একই শুভ্র জ্যোতি, ঐশী সত্তার একই প্রকার বিচ্ছুরণ; কিন্তু কাঁচের আবরণের বর্ণ ও ঘনত্বের পার্থক্যে রশ্মিনিঃসরণে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা ঘটিতেছে। কেন্দ্রে অবস্থিত শিখাটির দীপ্তি ও সৌন্দর্য সমান, কিন্তু যে জাগতিক যন্ত্রের মাধ্যমে তাহার প্রকাশ হয়, কেবল তাহারই অপূর্ণতাবশত তারতম্যে প্রতীতি ঘটে। বিকাশের মানদণ্ড অনুসারে আমরা যতই উচ্চে আরোহণ করিতে থাকিব, ততই প্রকাশযন্ত্র স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছতর হইতে থাকিবে।[৩]

মানুষ স্বরূপত ঈশ্বর

'অমৃতের পুত্র'—কি মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বলিতে চান না। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী—পবিত্র ও পূর্ণ। মর্ত্যভূমির দেবতা তোমরা ! তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের উপর ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ। ওঠ, এস, সিংহস্বরূপ হইয়া তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করিতেছ, ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়া দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির-আনন্দময়। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও, জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।[১]

এমনকি এই জগৎ, এই দেহ ও মন কুসংস্কাররাশি মাত্র; তোমরা অনন্ত আত্মা! আকাশের মিটমিট-করা তারাগুলি দ্বারা তুমি প্রতারিত হইবে! সেটা লজ্জার কথা। দিব্যাত্মা তোমরা—মিটমিট-করা ক্ষীণালোক নক্ষত্রগুলি তাহাদের অস্তিত্বের জন্য তোমারই কাছে ঋণী।[২]

মানব-প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু বীর্যবান, যাহা কিছু মঙ্গলময় এবং যাহা কিছু ঐশ্বর্যবান, সে-সবই ঐ ব্রহ্মসত্তা

হইতে উদ্ভূত; এবং যদিও তাহা অনেকের মধ্যেই সুপ্তভাবে বিরাজমান, তথাপি প্রকৃতপক্ষে মানুষে মানুষে কোনও প্রভেদ নাই, কারণ সকলেই সমভাবে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। যেন এক অনন্ত মহাসমুদ্র পশ্চাতে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আমি ও আপনারা সকলে সেই অনন্ত মহাসমুদ্র হইতে একটি তরঙ্গরূপে উত্থিত হইয়াছি। আমরা প্রত্যেকেই সেই অনন্তকে বাহিরে প্রকাশ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি। সুতরাং সুপ্ত সম্ভাবনার দিক হইতে দেখিতে গেলে সেই সৎ-চিৎ ও আনন্দময় মহাসাগরের সহিত আমরা স্বভাবত অভিন্ন, সেই মহাসাগরে আমাদের প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার রহিয়াছে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা সেই ঐশী সম্ভাবনাকে প্রকাশ করিবার তারতম্যের দরুন ঘটিয়াছে।[৩]

আত্মার এই অনন্ত শক্তি যখন জড়বস্তুর উপর পড়ে, তখন জাগতিক উন্নতি হয়; যখন আত্মার আলো চিন্তার উপর নিক্ষিপ্ত হয়, তখন চিন্তাশক্তি বিকশিত হয়; আর মানুষ যখন ঐ-শক্তিকে নিজের উপর প্রয়োগ করে, তখন মানুষ হইয়া যায় দেবতা। ... অতএব, তোমার ঐশী শক্তি ও দিব্যসত্তাকে তুমি প্রকাশ কর। তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া উঠিবে।[৪]

সুখ জীবনের লক্ষ্য নয়

মানুষের চরম লক্ষ্য সুখ নয়, জ্ঞান। সুখ ও আনন্দ তো শেষ হইয়া যায়। সুখই চরম লক্ষ্য—এরূপ মনে করা ভ্রম। জগতে আমরা যত দুঃখ দেখিতে পাই, তাহার কারণ—মানুষ অজ্ঞের মতো মনে করে, সুখই আমাদের চরম লক্ষ্য। কালে মানুষ বুঝিতে পারে, সুখের দিকে নয়, জ্ঞানের দিকেই সে ক্রমাগত চলিয়াছে। দুঃখ ও সুখ উভয়েই তাহার মহান শিক্ষক, সে শুভ এবং অশুভ হইতে সমভাবে শিক্ষা পায়। ...দেখিবে, সুখ দুঃখ—দুই-ই সমভাবে তাহার চরিত্র গঠনের উপাদান; চরিত্রকে এক বিশেষ ছাঁচে ঢালিবার পক্ষে ভাল-মন্দ উভয়েরই সমান অংশ আছে; কোন কোন স্থলে সুখ অপেক্ষা বরং দুঃখ অধিকতর শিক্ষা দেয়। জগতের মহাপুরুষদের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুখ অপেক্ষা দুঃখ তাঁহাদিগকে অধিক শিক্ষা দিয়াছে—ধনৈশ্বর্য অপেক্ষা দারিদ্র্য অধিক শিক্ষা দিয়াছে, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দারূপ আঘাতই তাঁহাদের অন্তরের অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে অধিক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে।[১]

ইন্দ্রিয়সুখ মানবজীবনের লক্ষ্য নয়, জ্ঞানই সমুদয় প্রাণীর লক্ষ্য। আমরা দেখিতে পাই, পশুগণ ইন্দ্রিয়সুখে যতটা প্রীতি

অনুভব করে, মানুষ বুদ্ধিশক্তির পরিচালনা করিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখ অনুভব করিয়া থাকে; আর ইহাও আমরা দেখিতে পাই, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির পরিচালনা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সুখে মানুষ অধিকতর সুখবোধ করিয়া থাকে। অতএব অধ্যাত্মজ্ঞানকে নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিতে হইবে। এই জ্ঞানলাভ হইলে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আসিবে। জাগতিক সকল বস্তুই সেই প্রকৃত জ্ঞান ও আনন্দের ছায়ামাত্র—শুধু তিন-চারি ধাপ নিম্নের প্রকাশ।[২]

একমাত্র মূঢ় ব্যক্তিরাই ইন্দ্রিয়-ভোগের পশ্চাতে ধাবিত হয়। ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক জীবন যাপন করা সহজ। পান-ভোজন-ক্রিয়ারূপ পুরাতন অভ্যস্ত পথে ভ্রমণ করা কঠিন নয়। কিন্তু আধুনিক দার্শনিকগণ বলিতে চান, 'এই অনায়াস-সাধ্য ভাবগুলি গ্রহণ কর এবং সেগুলির উপরই ধর্মের ছাপ দিয়া দাও।' এই ধরনের মতবাদ বিপজ্জনক। ইন্দ্রিয়-ভোগে মৃত্যু। আধ্যাত্মিক স্তরে যে জীবন, তাহাই যথার্থ জীবন। অন্য ভোগভূমির জীবন মৃত্যুরই নামান্তর। আমাদের এই জাগতিক জীবনকে একটি শব্দে বর্ণনা করা যাইতে পারে, উহা 'অভ্যাসের ব্যায়ামাগার'। যথার্থ জীবন উপভোগ করিতে হইলে আমাদিগকে ইহার ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে।[৩]

আমাদের চরিত্র রূপান্তরের কৌশল

আমরা যে কোন কর্ম করি—আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালন, আমাদের প্রত্যেক চিন্তা—চিত্তের উপর এইরূপ সংস্কার রাখিয়া যায়; যখন সংস্কারগুলি উপরিভাগে থাকে না, তখনও এত প্রবল থাকে যে, তাহারা অবচেতন মনে অজ্ঞাতসারে কার্য করিতে থাকে। আমরা প্রতি মুহূর্তে যাহা, তাহা আমাদের মনের উপর এই সংস্কার-সমষ্টির দ্বারা নিরূপিত হয়। এই মুহূর্তে আমার 'আমি' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আমার অতীত জীবনের সংস্কার-সমষ্টির ফল মাত্র। ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে 'চরিত্র' বলে। প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র এই সংস্কার-সমষ্টির দ্বারা নিরূপিত হয়। যদি শুভ সংস্কারগুলি প্রবল হয়, তবে চরিত্র সৎ হয়; অসৎ সংস্কারগুলি প্রবল হইলে চরিত্র অসৎ হয়। যদি কোন ব্যক্তি সর্বদা মন্দ কথা শোনে, মন্দ চিন্তা করে, মন্দ কাজ করে, তাহার মন মন্দ সংস্কারে পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং ঐগুলিই অজ্ঞাতসারে তাহার কর্ম ও চিন্তাকে প্রভাবিত করিবে। বাস্তবিক পক্ষে এই মন্দ সংস্কারগুলি সর্বদাই কাজ করিতেছে, সুতরাং ইহাদের ফলও মন্দ হইবে এবং ঐ ব্যক্তি একটি মন্দ লোক হইয়া দাঁড়াইবে—সে ঐরূপ না হইয়া পারে না। তাহার মনের এই সংস্কার-সমষ্টি মন্দ কাজ করিবার প্রবল প্রেরণা-শক্তি উৎপন্ন করিবে।

এই সংস্কারগুলির হাতে সে যন্ত্রতুল্য হইবে, এগুলি তাহাকে জোর করিয়া মন্দ কার্যে প্রবৃত্ত করিবে। এইরূপে যদি কেহ ভাল বিষয়ে চিন্তা করে এবং ভাল কাজ করে, সংস্কারগুলির সমষ্টি ভালই হইবে এবং অনুরূপভাবে ঐগুলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তিকে সৎকার্যে প্রবৃত্ত করিবে। যখন মানুষ এত বেশি ভাল কাজ করে এবং এত বেশি সৎ চিন্তা করে যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার প্রকৃতিতে সৎ কার্য করিবার অদম্য ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তখন সে কোন অন্যায় কার্য করিতে ইচ্ছা করিলেও ঐ সকল সংস্কারের সমষ্টি-স্বরূপ তাহার মন তাহাকে উহা করিতে দিবে না, সংস্কারগুলিই তাহাকে মন্দ কর্ম হইতে ফিরাইয়া আনিবে; সে তখন তাহার সৎ সংস্কারগুলি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়। যখন এইরূপ হয়, তখনই সেই ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হইয়াছে বলা যায়।[১]

যদি তুমি কোন ব্যক্তির চরিত্র যথার্থ বিচার করিতে চাও, তবে তাহার বড় বড় কার্যের দিকেই দৃষ্টি দিও না। অবস্থাবিশেষে নিতান্ত নির্বোধও বীরের মতো কার্য করিতে পারে। যখন কেহ অতি ছোট ছোট সাধারণ কার্য করিতেছে, তখন দেখ—সে কি ভাবে করিতেছে; এই ভাবেই মহৎ লোকের প্রকৃত চরিত্র জানিতে পারিবে। বড় বড় ঘটনা উপলক্ষ্যে অতি সামান্য লোকও মহত্ত্বে উন্নীত হয়। কিন্তু যাঁহার চরিত্র সর্বদা মহৎ, প্রকৃতপক্ষে তিনিই মহৎ। সর্বত্র সর্বাবস্থায় তিনি একই প্রকার।[২]

আমরা জগতে যতপ্রকার কার্য দেখিতে পাই, মনুষ্য-সমাজে যতপ্রকার আলোড়ন হইতেছে, আমাদের চতুর্দিকে যে সকল কার্য হইতেছে, সবই চিন্তার প্রকাশমাত্র, মানুষের ইচ্ছার প্রকাশমাত্র। ছোট বড় যন্ত্র, নগর, জাহাজ, রণতরী—সবই মানুষের ইচ্ছার বিকাশমাত্র। এই ইচ্ছা চরিত্র হইতে উদ্ভূত, চরিত্র আবার কর্মদ্বারা নির্মিত। ইচ্ছার প্রকাশ কর্মের অনুরূপ। প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যে সকল মানব জগতে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রচণ্ড কর্মী ছিলেন। তাঁহাদের এত ইচ্ছাশক্তি ছিল যে, তাঁহারা জগৎকে উলটপালট করিয়া দিতে পারিতেন। ঐ শক্তি তাঁহারা যুগযুগব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কর্ম দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন।[৩]

আমরা এখন যা হয়েছি, তা আমাদের চিন্তারই ফলস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কি চিন্তা কর, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো। বাক্য তো গৌণ জিনিস। চিন্তাগুলিই বহুকালস্থায়ী, আর তাদের গতিও বহুদূরব্যাপী। আমরা যে কোন চিন্তা করি, তাতেই আমাদের চরিত্রের ছাপ লেগে যায়; এইজন্য সাধুপুরুষদের ঠাট্টায় বা গালাগালিতে পর্যন্ত তাঁদের হৃদয়ের ভালবাসা ও পবিত্রতার একটুখানি রয়ে যায় এবং তা আমাদের কল্যাণসাধনই করে।[৪]

বড় কাজ করতে হলে দীর্ঘকাল ধরে লেগে পড়ে থাকতে হয়। জনকয়েক বিফল হলেও আমাদের চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। জগতের ধারাই এই যে, অনেকের পতন হবে,

বহু বাধা আসবে, দুর্লঙ্ঘ্য বিপদ উপস্থিত হবে এবং আধ্যাত্মিকতার আগুনে ভস্মীভূত হবার সময়েও মানুষের ভিতরের স্বার্থপরতা ও অন্যান্য দানবীয় ভাব প্রাণপণে লড়াই করে। 'ভালো'র দিকে যাবার পথটি সবচেয়ে দুর্গম ও বন্ধুর। এটাই আশ্চর্যের কথা যে, এত লোক সফল হয়; অনেকে যে পড়ে যায়, তাতে অবাক হবার কিছুই নেই! সহস্র পদস্খলনের ভেতর দিয়েই চরিত্র গড়ে তুলতে হবে।[৫]

এই বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে মন বিশেষরূপে নির্মল, সৎ ও বিচারপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। অভ্যাস করিবার আবশ্যক কি? কারণ প্রত্যেক কার্যই হ্রদের উপরিভাগে কম্পনশীল স্পন্দনস্বরূপ। এই কম্পন কালে মিলাইয়া যায়; থাকে কী? সংস্কারসমূহই অবশিষ্ট থাকে। মনে এইরূপ অনেক সংস্কার পড়িলে সেগুলি একত্র হইয়া অভ্যাসরূপে পরিণত হয়। 'অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব'—এইরূপ কথিত হইয়া থাকে; শুধু দ্বিতীয় স্বভাব নয়, উহা প্রথম স্বভাবও বটে—মানুষের সমুদয় স্বভাবই ঐ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আমরা এখন যেরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছি, তাহা পূর্ব অভ্যাসের ফল। সমুদয় অভ্যাসের ফল জানিতে পারিলে আমাদের মনে সান্ত্বনা আসে, কারণ যদি আমাদের বর্তমান স্বভাব কেবল অভ্যাসবশেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা যখন ইচ্ছা ঐ অভ্যাস দূর করিতেও পারি। আমাদের মনের ভিতর দিয়া যে চিন্তাস্পন্দনগুলি চলিয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটি এক-একটি দাগ রাখিয়া যায়,

সংস্কারগুলি তাহাদের সমষ্টি। আমাদের চরিত্র এই সকল সংস্কারের সমষ্টিস্বরূপ। যখন কোন বিশেষ বৃত্তি-তরঙ্গ প্রবল হয়, তখন মানুষ সেই ভাবে ভাবান্বিত হয়। যখন সদ্‌গুণ প্রবল হয়, তখন মানুষ সৎ হইয়া যায়; যদি মন্দভাব প্রবল হয়, তবে মন্দ হইয়া যায়। যদি আনন্দের ভাব প্রবল হয়, তবে মানুষ সুখী হইয়া থাকে। অসৎ অভ্যাসের একমাত্র প্রতিকার—তাহার বিপরীত অভ্যাস। যত কিছু অসৎ অভ্যাস আমাদের চিত্তে সংস্কারবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কেবল সৎ অভ্যাসের দ্বারা সেগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। কেবল সৎকার্য করিয়া যাও, অবিরতভাবে পবিত্র চিন্তা কর; অসৎ সংস্কার-নিবারণের ইহাই একমাত্র উপায়। কখনও বলিও না, অমুকের আর কোন আশা নাই; কারণ অসৎ ব্যক্তি কেবল একটি বিশেষ প্রকারের চরিত্রের পরিচয় দিতেছে। চরিত্র কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র, নূতন ও সৎ অভ্যাসের দ্বারা ঐগুলিকে দূর করা যাইতে পারে। চরিত্র কেবল পুনঃপুনঃ অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। পুনঃপুনঃ অভ্যাসই চরিত্র সংশোধন করিতে পারে।[৬]

ত্যাগ কর, সংসার ত্যাগ কর। আমরা এখন যেন একপাল কুকুর—রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছি, একটুকরো মাংস খাচ্ছি, আর ভয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি, পাছে কেউ এসে আমাদের তাড়িয়ে দেয়। তা না হয়ে রাজার মতো হও—জেনো যে, সমুদয় জগৎ তোমার। যতক্ষণ না তুমি সংসার ত্যাগ করছ, যতক্ষণ সংসার তোমায় বাঁধতে থাকবে, ততক্ষণ ঐ ভাবটি

তোমার আসতেই পারে না। যদি বাইরে ত্যাগ করতে না পারো, মনে মনে সব ত্যাগ কর। অন্তরের অন্তর থেকে সব ত্যাগ কর। বৈরাগ্যসম্পন্ন হও। এই হলো যথার্থ আত্মত্যাগ—এ না হলে ধর্মলাভ অসম্ভব। কোন প্রকার বাসনা করো না; কারণ যা বাসনা করবে, তাই পাবে। আর সেইটাই তোমার ভয়ানক বন্ধনের কারণ হবে।[৭]